BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link :: https://doi.org/10.70798/Bijmrd/02090026

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 9| October 2024| e-ISSN: 2584-1890

বাংলা পদাবলীতে ভাষা ও ছন্দের বিন্যাস: মধ্যযুগীয় কাব্যধারার প্রেক্ষিতে একটি গবেষণা

মানবেন্দ্র নাথ মাজী

গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মোকদমপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ

Email id- maji.mn@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলা পদাবলী কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ধারা, যেখানে ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এই গবেষণায় পদাবলী কাব্যের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এবং ছন্দের বিন্যাস মধ্যযুগীয় কাব্যধারার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পদাবলীর ভাষা সহজ, প্রাঞ্জল, আবেগপ্রবণ এবং সংগীতধর্মী, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ শব্দের মিশ্রণ এবং ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার এই কাব্যধারাকে একটি বিশেষ নান্দনিকতা প্রদান করেছে। একই সঙ্গে অলংকার, রূপক ও সংলাপধর্মী ভঙ্গির মাধ্যমে ভাষা আরও জীবন্ত ও চিত্রময় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, পদাবলীর ছন্দ—বিশেষত পয়ার, ত্রিপদী ও বিভিন্ন মাত্রাবৃত্ত—এর গীতিধর্মিতাকে শক্তিশালী করেছে এবং কাব্যকে সংগীতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। তাল-লয়, পুনরুক্তি এবং ধ্বনিগত সৌন্দর্যের ব্যবহারে এই কাব্যধারা শ্রুতিমধুর ও স্মরণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ভাষা ও ছন্দের এই আন্তঃসম্পর্ক পদাবলীকে কেবল পাঠ্য নয়, বরং একটি শ্রাব্য ও অনুভবযোগ্য সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, পদাবলী কাব্য বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংগীত ঐতিহ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত।

মূল শব্দ : *পদাবলী কাব্য, ভাষার বৈশিষ্ট্য, ছন্দের বিন্যাস, মধ্যযুগীয় সাহিত্য, গীতিধর্মিতা।*

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে মধ্যযুগ একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও রূপান্তরমুখী পর্ব, যেখানে ধর্মীয় ভাবধারা, আধ্যাত্মিক অন্বেষণ এবং ভক্তিমূলক চেতনা সাহিত্যসৃষ্টির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই সময়ে সমাজজীবন ছিল বহুমাত্রিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসরমান—রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন, এবং ধর্মীয় পুনর্জাগরণের প্রভাবে মানুষের মানসিক জগতে এক নতুন অনুসন্ধিৎসা জন্ম নেয়। সেই অনুসন্ধিৎসার কেন্দ্রে ছিল আত্মিক শান্তি, ঈশ্বরানুভূতি এবং মানব-দৈব সম্পর্কের গভীর উপলব্ধি।

এই প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে ভক্তিমূলক কাব্যধারার বিকাশ ঘটে, তার মধ্যে *পদাবলী কাব্য* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদাবলী কাব্য মূলত বৈষ্ণব ভক্তিধারার অন্তর্গত হলেও এর আবেদন কেবল ধর্মীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানবিক আবেগ, প্রেম, বেদনা, আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মসমর্পণের এক সর্বজনীন রূপকে ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলা এই কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু হলেও তা নিছক পার্থিব প্রেমের বর্ণনা নয়; বরং তা আত্মা ও পরমাত্মার মিলন, মানব ও ঈশ্বরের চিরন্তন সম্পর্কের এক প্রতীকী ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ।

পদাবলী কাব্যের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এর ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব সমন্বয়, যা এই কাব্যধারাকে এক অনন্য নান্দনিকতা ও সংগীতময়তা প্রদান করেছে। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় সরলতা, প্রাঞ্জলতা এবং আবেগঘনতা, তেমনি ছন্দের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় সুরেলা বিন্যাস, তাল-লয়ের সুষম ব্যবহার এবং গীতিধর্মিতার প্রাধান্য। এই ভাষা ও ছন্দের সম্মিলিত রূপ পদাবলীকে কেবল পাঠ্য নয়, শ্রাব্য এবং অনুভবযোগ্য সাহিত্যে রূপান্তরিত করেছে। ফলে এটি কেবল সাহিত্যিক রচনা হিসেবে নয়, সংগীত ও পারফরমেটিভ শিল্পের অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আরও গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পদাবলী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ কেবল নান্দনিকতার বাহক নয়; এগুলি মধ্যযুগীয় সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং লোকজ ঐতিহ্যের প্রতিফলন বহন করে। ভাষার মধ্যে যেমন লোকভাষার প্রভাব, তদ্ভব ও দেশজ শব্দের ব্যবহার এবং ব্রজবুলি ভাষার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ছন্দের মধ্যে লোকসংগীতের ছাপ, কীর্তনধর্মী সুর এবং মৌখিক পরিবেশনার উপযোগিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে পদাবলী কাব্য একদিকে যেমন উচ্চাঙ্গ সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত হয়।

উদ্দেশ্য: এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলা পদাবলী কাব্যের ভাষাগত রূপ এবং ছন্দের কাঠামোকে মধ্যযুগীয় কাব্যধারার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা। এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে—কীভাবে ভাষা ও ছন্দের এই বিশেষ বিন্যাস পদাবলী কাব্যকে এক অনন্য সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত করেছে এবং কীভাবে এটি মধ্যযুগীয় বাংলা সমাজের মানসিকতা ও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতিফলন হিসেবে কাজ করেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যধারার প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য মূলত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এই সময়ে সাহিত্যচর্চা কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধের প্রচার এবং আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। *মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* এবং *বৈষ্ণব পদাবলী*—এই তিনটি প্রধান কাব্যধারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ করে।

মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, যা লোকবিশ্বাস ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। অন্যদিকে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের লীলাকথা নাটকীয় ও সংলাপধর্মী ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এই ধারাগুলির মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার, যা বাংলা সাহিত্যে এক নবজাগরণের সূচনা করে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এই ধারাকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করে। তাঁর প্রচারিত প্রেমভক্তি বা 'প্রেমভক্তি আন্দোলন' মানুষের ধর্মীয় চেতনার মধ্যে এক গভীর পরিবর্তন আনে। এখানে ঈশ্বর আর দূরবর্তী কোনো সত্তা নন; বরং তিনি প্রেমের মাধ্যমে উপলব্ধ এক নিকটবর্তী অভিজ্ঞতা। এই ধারণা পদাবলী কাব্যের বিষয়বস্তু ও ভাষার উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

এই সময়ে সাহিত্য কেবলমাত্র পণ্ডিত বা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি লোকসমাজে মৌখিকভাবে প্রচারিত হতো। কীর্তন, পালাগান এবং অন্যান্য লোকসংগীতের মাধ্যমে পদাবলী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেত। ফলে ভাষা হয়ে ওঠে সহজ, সাবলীল এবং আবেগঘন। জটিলতা পরিহার করে এমন এক ভাষাশৈলী গড়ে ওঠে, যা শ্রোতার হৃদয়ে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

এছাড়াও, মধ্যযুগীয় সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ—যেমন গ্রামীণ জীবন, লোকবিশ্বাস, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় আচার—পদাবলী কাব্যের গঠন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সমস্ত উপাদান মিলিয়ে পদাবলী কাব্য একটি জীবন্ত ও গতিশীল সাহিত্যরূপে পরিণত হয়, যা একইসঙ্গে ধর্মীয়, নান্দনিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। অতএব, বলা যায় যে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যধারার প্রেক্ষাপট পদাবলী কাব্যের ভাষা ও ছন্দের বিন্যাস বোঝার জন্য অপরিহার্য। এই প্রেক্ষাপট ছাড়া পদাবলীর নান্দনিকতা, সংগীতধর্মিতা এবং জনপ্রিয়তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

পদাবলী কাব্যের ভাষা তার অন্যতম প্রধান ও স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য, যা এই কাব্যধারাকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে। এই ভাষা একাধারে সহজ, সুললিত, আবেগময় এবং সংগীতধর্মী—যা পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম। পদাবলীর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এটি কেবলমাত্র সাহিত্যিক রীতি নয়, বরং একটি বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক প্রকাশ, যেখানে লোকজ উপাদান, ধর্মীয় অনুভূতি এবং নান্দনিক চেতনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। নিচে এই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হলো—

সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষার ব্যবহার: পদাবলী কাব্যের ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজতা ও প্রাঞ্জলতা। মধ্যযুগীয় সমাজে অধিকাংশ মানুষই ছিলেন অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত; ফলে সাহিত্যকে যদি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হতো, তবে ভাষাকে অবশ্যই সহজ ও বোধগম্য হতে হতো। পদাবলী কবিরা এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তারা এমন এক ভাষাশৈলী গড়ে তুলেছিলেন, যা সরাসরি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে।

এই ভাষায় তৎসম, তদ্ভব এবং দেশজ শব্দের একটি সুষম মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তৎসম শব্দ ভাষাকে একটি সাহিত্যিক গাম্ভীর্য প্রদান করে, তদ্ভব শব্দ ভাষাকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক করে তোলে, এবং দেশজ শব্দ ভাষায় লোকজ স্বাদ ও প্রাণ সঞ্চার করে। উদাহরণস্বরূপ—

"সখি, কেমনে ধরিব হিয়া,
শ্যাম না এলে দহে দেহ জ্বালা।"

এখানে 'কেমনে', 'হিয়া', 'দহে' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে সহজ ভাষার ব্যবহার স্পষ্ট। আবার—

"শুন সখি, বলি তোমারে,
রাধার দুঃখের নাহি অন্তরে।"

এই ধরনের ভাষা সাধারণ মানুষের অনুভূতির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে। এই সহজতা কেবল ভাষার গঠনেই সীমাবদ্ধ নয়; বাক্যবিন্যাসেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। ছোট ছোট বাক্য, পুনরুক্তি, এবং সরাসরি অভিব্যক্তি পদাবলীর ভাষাকে আরও প্রাণবন্ত ও প্রভাবশালী করে তুলেছে।

ব্রজবুলি ভাষার প্রভাব: বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষার ক্ষেত্রে ব্রজবুলি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা, যা মৈথিলী ও বাংলার সংমিশ্রণে গঠিত। এই ভাষার ব্যবহার মূলত একটি নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সাধন করে। ব্রজবুলি ভাষার মাধ্যমে কবিরা রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে এক ধরনের অতীন্দ্রিয় ও ঐশ্বরিক আবহে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন—

"কি কহব সখি, পিয়ার বিরহে,
দেহ জ্বলে, মন নহি রহে।"

এখানে 'কহব', 'পিয়ার', 'নহি' শব্দগুলি ব্রজবুলির স্বতন্ত্র রূপ নির্দেশ করে। আবার—

"চিরদিন রহিব পিয়ার সনে,
এ মোর অন্তর বাসনা।"

এই ভাষা দৈনন্দিন কথ্য ভাষা থেকে কিছুটা ভিন্ন হওয়ায় এর মধ্যে একটি কাব্যিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়, যা পাঠককে এক বিশেষ অনুভূতির জগতে নিয়ে যায়। এছাড়া ব্রজবুলি ভাষার ধ্বনিগত মাধুর্য এবং সুরেলা গঠন পদাবলীর গীতিধর্মিতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এর শব্দচয়ন, ধ্বনিসংগঠন এবং ছন্দবিন্যাস এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে তা সহজেই সংগীতের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। ফলে ব্রজবুলি ভাষা কেবল একটি ভাষাগত মাধ্যম নয়, বরং একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতার বাহক।

অলংকার ও রূপকের প্রয়োগ: পদাবলী কাব্যের ভাষায় অলংকারের ব্যবহার অত্যন্ত লক্ষণীয় এবং তা এই কাব্যধারার নান্দনিক সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। উপমা, রূপক, অনুপ্রাস, শ্লেষ ইত্যাদি অলংকারের সুনিপুণ প্রয়োগ পদাবলীর ভাষাকে এক বিশেষ কাব্যিক উচ্চতায় উন্নীত করেছে। উদাহরণস্বরূপ—

"চাঁদের মতন মুখখানি তার,
পদ্মফুল লাজে ঝরে।"

এখানে উপমার মাধ্যমে রাধার রূপের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। আবার—

"শ্যাম রঙে রাঙা হলো প্রাণ,
মেঘে ঢাকে যেন আকাশখান।"

এখানে রূপকের সাহায্যে কৃষ্ণের শ্যামবর্ণ ও আবেগের গভীরতা চিত্রিত হয়েছে। অনুপ্রাসের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—

"মধুর মুরলী মধুবনে বাজে"

'ম' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ভাষাকে সুরেলা করে তোলে এবং শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করে।

রূপকের মাধ্যমে পার্থিব প্রেমকে আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রতীকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কেবল একটি মানবিক সম্পর্ক নয়; এটি আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই রূপকধর্মিতা পদাবলীর ভাষাকে একটি গভীর দার্শনিক তাৎপর্য প্রদান করে।

আবেগপ্রবণতা ও ভক্তিভাব: পদাবলী কাব্যের ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর গভীর আবেগপ্রবণতা এবং ভক্তিভাব। এই ভাষা হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিগুলিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। রাধার বিরহবেদনার একটি উদাহরণ—

"না এলে শ্যাম, কাঁদে রাধার প্রাণ,
আঁখি জলে ভাসে দিবস রজনী।"

এখানে বিরহের তীব্রতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার মিলনের আনন্দ—

"পাইয়াছি আজ শ্যামের সঙ্গ,
ভাসে প্রাণ আনন্দে।"

এই ধরনের ভাষা ভক্তির আনন্দ ও আত্মিক পরিতৃপ্তিকে প্রকাশ করে।

ভক্তিভাব পদাবলীর ভাষাকে এক বিশেষ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মাত্রা প্রদান করে। এখানে প্রেম ও ভক্তি একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে, যা "মাধুর্যভাব" নামে পরিচিত। এই মাধুর্যভাবই পদাবলীর ভাষাকে অন্য যেকোনো কাব্যধারা থেকে পৃথক করে।

সংলাপধর্মী ও নাটকীয় ভঙ্গি

পদাবলী কাব্যের ভাষার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর সংলাপধর্মী ও নাটকীয় ভঙ্গি। অনেক পদে রাধা, কৃষ্ণ, সখী বা দূতীর মধ্যে সরাসরি সংলাপ উপস্থাপিত হয়েছে, যা কাব্যকে একটি নাটকীয় রূপ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ—

"রাধা বলে—সখি, কোথায় শ্যাম?
সখী বলে—যমুনাতীরে।"

আবার—

"কৃষ্ণ বলে—রাধে, কেন এ বিরহ?
রাধা কহে—তোমা বিনে জীবন নহে।"

এই সংলাপধর্মিতা কাব্যের আবেগকে আরও জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করে তোলে। পাঠক বা শ্রোতা যেন ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে ওঠে এবং চরিত্রগুলির অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। নাটকীয় ভঙ্গি কেবল সংলাপেই সীমাবদ্ধ নয়; পরিস্থিতির বর্ণনা, আবেগের উত্থান-পতন এবং ঘটনাপ্রবাহের বিন্যাসেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। এই নাটকীয়তা পদাবলীকে কেবল পাঠ্য কাব্য নয়, বরং পরিবেশনযোগ্য সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা কীর্তন ও সংগীতের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থাপিত হতো।

বাংলা পদাবলীর ছন্দের বিন্যাস

বাংলা পদাবলী কাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর ছন্দের বিন্যাস, যা এই কাব্যধারাকে সংগীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করেছে। পদাবলী মূলত গীতিকাব্য; তাই এর ছন্দ কেবলমাত্র শব্দবিন্যাসের কাঠামো নয়, বরং তা সুর, তাল ও লয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নান্দনিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যই পদাবলীকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছে এবং লোকমুখে প্রচারের উপযোগী করেছে। নিচে পদাবলীর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পাঠ্য প্রমাণসহ বিশদভাবে আলোচনা করা হলো—

পয়ার ছন্দ

পদাবলী কাব্যে বহুল ব্যবহৃত ছন্দ হলো *পয়ার ছন্দ,* যা ১৪ মাত্রার একটি সহজ ও সুষম গঠনবিশিষ্ট ছন্দ। এই ছন্দের গতি স্বাভাবিক, শ্রুতিমধুর এবং গীতিযোগ্য হওয়ায় এটি পদাবলীর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পয়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো এর নিয়মিত মাত্রাবিন্যাস, যা আবৃত্তি ও গানে সমানভাবে প্রাঞ্জল। উদাহরণস্বরূপ—

"না এলে শ্যাম, কাঁদে রাধার প্রাণ,
আঁখি জলে ভাসে দিবস রজনী।"

এই পংক্তিদ্বয়ে মাত্রার সুষম বিন্যাস এবং স্বাভাবিক গতি লক্ষ করা যায়, যা পয়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য বহন করে। আবার—

"শুন সখি, বলি তোমারে কথা,
অন্তরে জ্বলে বিরহের ব্যথা।"

এখানেও ১৪ মাত্রার সুষম ছন্দ কাব্যকে সহজ ও গীতিময় করেছে। পয়ার ছন্দের এই সরলতা পদাবলীকে লোকসমাজে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

ত্রিপদী ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

পদাবলী কাব্যে ত্রিপদী এবং বিভিন্ন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। ত্রিপদী ছন্দ সাধারণত তিনটি চরণের সমন্বয়ে গঠিত এবং এতে আবেগের গতি ও পরিবর্তন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ—

"কি কহব সখি, দুখের কথা,
পিয়ার বিরহে জ্বলে মোর ব্যথা,
নিশিদিন কাঁদি একাকী।"

এখানে তিনটি চরণের মাধ্যমে আবেগ ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে, যা ত্রিপদী ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কবিরা নির্দিষ্ট মাত্রা অনুসরণ করে আবেগের ভিন্নতা প্রকাশ করেছেন। যেমন—

"মধুর মুরলী বাজে বনে,
ডাকে শ্যাম আপন সনে।"

এখানে সংক্ষিপ্ত মাত্রাবিন্যাস এবং দ্রুত গতি আবেগকে তীব্র ও গতিশীল করে তুলেছে। এই বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহারের মাধ্যমে পদাবলী কবিরা কখনো বিরহের ধীরতা, কখনো মিলনের উচ্ছ্বাস, আবার কখনো ভক্তির গভীরতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

গীতিধর্মিতা ও তাল-লয়ের ব্যবহার: পদাবলী কাব্যের ছন্দের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর গীতিধর্মিতা। এই কাব্য মূলত গাওয়ার জন্য রচিত, তাই এতে তাল ও লয়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিটি পদের সঙ্গে নির্দিষ্ট রাগ ও তাল যুক্ত থাকত, যা এর সংগীতধর্মিতাকে আরও সমৃদ্ধ করত। উদাহরণস্বরূপ—

"মধুর মুরলী মধুবনে বাজে,
শুনি রাধা যায় উন্মাদ সাজে।"

এই পংক্তিতে ধ্বনিগত সুরেলা গঠন এবং পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একটি স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতধর্মিতা সৃষ্টি হয়েছে। আবার—

"রাধে রাধে বলো সবে,
শ্যাম নাম সুধার রবে।"

এই ধরনের পুনরুক্তিমূলক ছন্দ সহজেই কীর্তনের তালে গাওয়া যায় এবং শ্রোতার মনে দ্রুত প্রভাব ফেলে। তাল-লয়ের এই সুনিপুণ ব্যবহার পদাবলীকে কেবল পাঠ্য নয়, বরং এক জীবন্ত সংগীতধর্মী অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছে।

পুনরুক্তি ও ধ্বনিগত সৌন্দর্য: পদাবলীর ছন্দে পুনরুক্তি, অনুপ্রাস এবং ধ্বনিগত সামঞ্জস্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা এর মাধুর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। শব্দের পুনরাবৃত্তি এবং ধ্বনির সাদৃশ্য কাব্যকে শ্রুতিমধুর করে তোলে এবং সহজে মনে রাখার উপযোগী করে। উদাহরণস্বরূপ—

"রাধে রাধে জপো রে প্রাণ,
শ্যাম নাম অমৃতসমান।"

এখানে 'রাধে রাধে' পুনরুক্তির মাধ্যমে ছন্দে এক ধরনের সুরেলা আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। অনুপ্রাসের ক্ষেত্রেও—

"মধুর মুরলী মধুবনে বাজে"

'ম' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ধ্বনিগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এবং ছন্দকে আরও মাধুর্যময় করেছে। এই ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য পদাবলীকে কেবল অর্থবহ নয়, শ্রুতিনির্ভর এক নান্দনিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেছে, যা শ্রোতার মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

ভাষা ও ছন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক : পদাবলী কাব্যে ভাষা ও ছন্দ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—এ কথা কেবল একটি তাত্ত্বিক বক্তব্য নয়, বরং পদাবলীর প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনের একটি মৌলিক চাবিকাঠি। এখানে ভাষা যেমন আবেগ, ভাব ও অর্থের বাহক, তেমনি ছন্দ সেই ভাষাকে সুর, গতি ও প্রাণ প্রদান করে। ফলে ভাষা ও ছন্দের এই সমন্বয় পদাবলীকে এক অনন্য সংগীতময় সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পদাবলীর ভাষা সাধারণত সহজ, প্রাঞ্জল ও আবেগঘন। কিন্তু এই ভাষা তার পূর্ণ রূপ লাভ করে ছন্দের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ—

"মধুর মুরলী মধুবনে বাজে,
শুনি রাধা যায় উন্মাদ সাজে।"

এখানে 'মধুর', 'মুরলী', 'মধুবনে'—এই শব্দগুলির ধ্বনিগত পুনরাবৃত্তি যেমন ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, তেমনি ছন্দের বিন্যাস এই শব্দগুলিকে সুরেলা প্রবাহে বেঁধে দিয়েছে। ফলে এটি কেবল একটি বাক্য নয়, বরং একটি সংগীতধর্মী অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। আবার—

"না এলে শ্যাম, কাঁদে রাধার প্রাণ,
আঁখি জলে ভাসে দিবস রজনী।"

এই পংক্তিতে ভাষার আবেগ (বিরহবেদনা) ছন্দের ধীর ও সুষম গতির মাধ্যমে আরও গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ছন্দ যেন আবেগের বাহন হয়ে উঠেছে। ছন্দ ভাষাকে একটি সুরেলা কাঠামো প্রদান করে, যার ফলে শব্দগুলি শুধু অর্থ বহন করে না, বরং সঙ্গীতের মতো অনুভূতি সৃষ্টি করে। ভাষার সরলতা ছন্দের মাধুর্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রোতার মনে এক গভীর আবেগময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই কারণে পদাবলী কেবল পাঠ্য নয়, বরং শ্রাব্য ও অনুভবযোগ্য সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া, পদাবলীর পরিবেশনধর্মী চরিত্রও ভাষা ও ছন্দের এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছে। কীর্তনের মাধ্যমে যখন পদগুলি গাওয়া হতো, তখন ভাষার প্রতিটি শব্দ ছন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সম্মিলিত সুর সৃষ্টি করত। ফলে ভাষা ও ছন্দের এই ঐক্য পদাবলীর প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মধ্যযুগীয় কাব্যধারায় পদাবলীর গুরুত্ব

পদাবলী কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এটি কেবল একটি সাহিত্যধারা নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের অংশ, যা সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রথমত, পদাবলী কাব্য ধর্মীয় ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ও হৃদয়গ্রাহীভাবে পৌঁছে দিয়েছে। জটিল দর্শন বা তত্ত্বকে সরল ভাষা ও সুরেলা ছন্দের মাধ্যমে উপস্থাপন করে এই কাব্যধারা ভক্তির এক সহজ পথ উন্মোচন করেছে। উদাহরণস্বরূপ—

"রাধে রাধে বলো সবে,
শ্যাম নাম সুধার রবে।"

এই ধরনের পংক্তি সহজেই মানুষের মুখে মুখে ফিরত এবং ভক্তির অনুভূতিকে জাগ্রত করত।

দ্বিতীয়ত, পদাবলী বাংলা ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এতে ব্যবহৃত সহজ, প্রাঞ্জল ও সঙ্গীতধর্মী ভাষা বাংলা ভাষাকে এক নতুন রূপ দিয়েছে, যা পরবর্তীকালের সাহিত্যচর্চার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

তৃতীয়ত, এই কাব্যধারা বাংলা সংগীত, নাটক এবং লোকসংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। কীর্তন, পদগান, পালাগান প্রভৃতি ধারায় পদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, পদাবলীর সংলাপধর্মী রীতি ও নাটকীয়তা পরবর্তীকালে বাংলা নাট্যধারার বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

চতুর্থত, পদাবলী কাব্যের প্রভাব আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতিকবিতায় পদাবলীর ভাষা ও ছন্দের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অনেক গানে বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য ও সুরেলা ছন্দের অনুরণন শোনা যায়।

অতএব, বলা যায় যে পদাবলী কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা কেবল সাহিত্যিক নয়, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও গভীর তাৎপর্য বহন করে। ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি এক চিরন্তন সাহিত্যিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, যার প্রভাব আজও সমানভাবে অনুভূত হয়।

উপসংহার: বাংলা পদাবলী কাব্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, যেখানে ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। এর ভাষা সহজ, আবেগঘন এবং সঙ্গীতময়; ছন্দ মধুর, গীতিধর্মী এবং শ্রুতিমাধুর্যে ভরপুর। এই কাব্যধারা কেবল ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ নয়, বরং মানবিক আবেগের গভীরতর রূপায়ণ। ভাষা ও ছন্দের এই সুনিপুণ বিন্যাস পদাবলীকে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত করেছে। অতএব, বলা যায় যে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যধারার প্রেক্ষিতে পদাবলীর ভাষা ও ছন্দের বিন্যাস শুধু সাহিত্যিক নয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৩।

২. সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৪।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত: মধ্যযুগ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭১।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৮৫।

৫. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৯।

৬. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৬।

৭. সেন, ক্ষিতিমোহন। *ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫১।

৮. বসু, বুদ্ধদেব। *বাংলা কাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৮।

৯. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৭০।

১০. মজুমদার, রামেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ*। ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৬০।

১১. রায়, নিহাররঞ্জন। *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪৯।

১২. দে, সুশীলকুমার। *বৈষ্ণব সাহিত্য*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৫৭।

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্য*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯২৯।

১৪. ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮২।

১৫. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। *চৈতন্য সাহিত্য*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৬।

Citation: **মাজী. মা. না.**., (2024) "বাংলা পদাবলীতে ভাষা ও ছন্দের বিন্যাস: মধ্যযুগীয় কাব্যধারার প্রেক্ষিতে একটি গবেষণা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-9, October-2024.